চরিতমালা

ইউনিট ১২

ভূমিকা

চরিতমালা অধ্যায়ে কয়েকজন মহান ব্যক্তিবর্গের জীবনচরিত সম্পর্কে আলোচনা হবে। যাঁরা বৌদ্ধধর্ম দর্শন, সংস্কৃতি ও মানবতার কল্যাণে নানাভাবে অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে তথাগত বুদ্ধের শিষ্য প্রশিষ্য ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ রয়েছেন। এ ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ 'থের-থেরী' নামে পরিচিত। এছাড়া আছে রাজন্যবর্গ ও খ্যাতি সম্পন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বলা হয় 'শ্রেষ্ঠী'। তথাগত গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক কালে এবং বুদ্ধের জীবদ্দশা পরবর্তী কালে সর্বজীবের কল্যাণে এ মহৎ ব্যক্তিগণ নানাভাবে অবদান রেখেছেন। এভাবে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ বৌদ্ধধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আপন কর্মের মাধ্যমে জগতে খ্যাত হয়েছেন। এরূপ কর্মোজ্জ্বল বহু জীবন চরিত বৌদ্ধধর্ম দর্শনের ইতিহাসে রয়েছে। সংযুক্ত পাঠসমূহে থের-থেরীদের পরিচয়সহ কয়েকটি নির্বাচিত জীবনচরিত তুলে ধরা হলো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ পাঠ -১২.১ : থের- থেরী কথা পাঠ -১২.২ : সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন পাঠ -১২.৩ : পূর্ণিকা থেরী পাঠ -১২.৪ : বিশাখা পাঠ -১২.৫ : থেরী কিসা গৌতমী পাঠ -১২.৬ : রাজা বিম্বিসার পাঠ -১২.৭ : রাজা প্রসেনজিৎ	তথাগত গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক কালে এবং বুদ্ধের জীবদ্দশা পরবর্তী কালে সর্বজীবের কল্যাণে এ মহৎ ব্যক্তিগণ নানাভাবে অবদান রেখেছেন। এভাবে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ বৌদ্ধধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আপন কর্মের মাধ্যমে জগতে খ্যাত হয়েছেন। এরূপ কর্মোজ্জ্বল বহু জীবন চরিত বৌদ্ধধর্ম দর্শনের ইতিহাসে রয়েছে। এসব চরিতমালা অনুকরণীয়।

পাঠ-১২.১ থের - থেরী কথা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- থের–থেরীর পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- থের–থেরীদের জীবন চরিতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন

মুখ্য শব্দ (Key Words)	থের- থেরী, স্থবির, আদর্শিক ব্যক্তিত্ব, জীবনের উৎকর্ষতার কাহিনী, মর্যাদাপূর্ণ।

থের-থেরীদের পরিচয়

বৌদ্ধধর্ম দর্শনে সর্বজন পূজ্য আদর্শিক ব্যক্তিত্ব হলো থের–থেরীগণ। 'থের' ও 'থেরী' যথাক্রমে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ পালি শব্দ। বাংলায় 'স্থবির' বলা হয়। সাধারণ অর্থে 'থের' বলতে স্থবির বা স্থিত থাকাকে (উত্তীর্ণ হওয়াকে) বোঝায় । অথাৎ, বুদ্ধের শাসনে বা বুদ্ধ প্রবর্তিত ব্রহ্মচর্য জীবনে স্থিত থাকাকে বোঝায়। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁরা কমপক্ষে দশ বছর সঙ্ঘের নিয়মের মধ্যে স্থিত থাকেন তাঁদের স্থবির বা থের বলা হয়। এই থের বা স্থবির এক প্রকার উপাধি বা অভিধা। বর্তমানকালে অত্যন্ত আনুষ্ঠানিকতার সাথে ভিক্ষুদের এই অভিধা প্রদান করা হয়। বুদ্ধের সময়ে সম্মতি থের নামেও এক প্রকার থের–থেরী ছিল। যাঁরা বুদ্ধের দেশনা শ্রবণ করে কিংবা ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে অচিরেই অরহত্ব ফলে উন্নীত হয়েছেন তাঁদেরকে 'সম্মতি থের' বলা হয়। ভিক্ষুণীরা পরিচিত হন 'থেরী' নামে।

বর্তমান কালে সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুণীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ভিক্ষুদের জীবনে সাঙ্ঘিক অভিধা হিসেবে 'থের' বা 'মহাথের' পদে অভিষিক্ত হওয়া অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রচলিত নিয়মে ভিক্ষু জীবনে দশবছরে স্থবির বা থের এবং বিশ বছরে মহাথের বা মহাস্থবির অভিধায় অভিষিক্ত হন।

বুদ্ধের সমসাময়িককালের থের ও থেরীদের অনেকে নিজের জীবনের উৎকর্ষতার কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। তাঁদের সেই বক্তব্যের সমাবেশ ঘটেছে 'থের–থেরী গাথা' নামক গ্রন্থে। থের ও থেরীদের গাথাসমূহ গভীর দার্শনিক ও কবিত্বপূর্ণ। তাঁদের উচ্চারিত গাথার মধ্যে তাঁদের জীবনের সুখ ও দুঃখের বর্ণনাসহ জীবন চর্যার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গাথাগুলো বৌদ্ধ সাহিত্যের এক অমর কাব্য। এতে অতীতের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিভাত হয়েছে।

থের ও থেরীদের মতে বৌদ্ধ সাহিত্যে অনেক রাজা ও শ্রেষ্ঠীর কাহিনী রয়েছে। এ রাজা, মহারাজা ও শ্রেষ্ঠীগণ বৌদ্ধধর্মের বিকাশ সাধনে অনেক অবদান রেখেছিলেন। এসব মহাপ্রাণ থের–থেরী, রাজা, মহারাজা ও শ্রেষ্ঠীদের জীবনচরিত পড়ে আমরা নিজেদের জীবন গঠনের প্রেরণা পাই। ত্যাগ আদর্শের বহুবিধ দৃষ্টান্তে তাঁদের জীবন ভরপুর। তাঁদের উদার মানবিকতা, দান ও সার্বিক সহযোগিতা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে আজো। তাঁদের জীবনাদর্শ সকলের অনুসরণযোগ্য।

সারসংক্ষেপ :

থের ও থেরীগণ ঐতিহাসিক আদর্শ বৌদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তাঁদের জীবন চরিত অত্যন্ত আলোকময়। তাঁদের আদর্শ অনুকরণীয়। তাঁদের উচ্চারিত গাথায় বৌদ্ধধর্ম দর্শনের বহু উপাদান রয়েছে। এই গাথাগুলো বৌদ্ধ সাহিত্যের অমর কাব্য স্বরূপ। এসব মহৎ প্রাণ থের–থেরী, রাজা, মহারাজা ও শ্রেষ্ঠীদের জীবনচরিত পাঠে আমরা উজ্জীবিত হই। তাঁদের আদর্শ প্রজন্ম পরম্পরায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। পরহিতে ও কল্যাণ কর্মে উৎসাহিত করে। তাই তাঁদের জীবনীর গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'থের' বলতে বাংলায় কী বোঝায় ?

ক. স্থবির বোঝায় খ. স্থিরতা বোঝায়

গ. স্থাবর বোঝায় ঘ. স্থাপত্য বোঝায়

২। থের–থেরীদের জীবন কাহিনী কোথায় বর্ণিত হয়েছে ?

ক. পৌরাণিক সাহিত্যে খ. বাংলা সাহিত্যে

গ. 'থের–থেরী গাথা' গ্রন্থে ঘ. জাতক গ্রন্থে

৩। অতীতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি কোথায় প্রতিভাত হয়েছে ?

ক. বুদ্ধগাথায় খ. শ্রেষ্ঠী কথায়

গ. জ্ঞানীকথায় ঘ. থের–থেরী গাথায়

উত্তরমালা : ১. ক, ২. গ ৩. ঘ

পাঠ-১২.২ সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন- এর পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নের কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করতে পারবেন

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অগ্রশাবক, ধর্মসেনাপতি, ঋদ্ধিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ, মহাশ্রাবক, বিক্ষেপবাদী, ধর্মচক্রপ্রবত্তন সূত্র, অশ্বজিৎ, উপতিষ্য-কোলিত।

সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন থের- এর জীবনী

সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন ছিলেন বুদ্ধের অত্যন্ত মেধাবী শিষ্য। বুদ্ধের অন্যান্য শিষ্য বা ভিক্ষুদের মধ্যে তাঁরা দু'জন ছিলেন অনন্য অসাধারণ।। তাঁরা ছিলেন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক। অগ্রশ্রাবক হলো বুদ্ধের শ্রাবক শিষ্যদের অগ্রগণ্য বা শীর্ষ পদাধিকারি। সারিপুত্র জ্ঞানে এবং মৌদ্‌গল্যায়ন ঋদ্ধিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। আবার অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ধর্মসেনাপতি নামেও পরিচিত ছিলেন।

সারিপুত্রের গৃহী নাম ছিল উপতিষ্য। সারি ব্রাহ্মণীর পুত্র বলে তাঁকে সারিপুত্র বলা হতো। তাঁর জন্মস্থান নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে উপতিষ্য বা নালক নামক গ্রামে। গ্রামের নামের সাথে ব্যক্তির নামের সাদৃশ্য থেকে অনুমিত হয় যে তাঁরা অত্যন্ত উচ্চবংশীয় ছিলেন। হয়তো তাঁদের বংশের নামেই গ্রামের নামকরণ হয়। তাঁর পিতার নাম জানা যায় না। তবে তিনি একজন উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিল বলে ধারণা করা হয়।

মোগ্‌গলী ব্রাহ্মণীর পুত্র বলে মৌদগল্যায়নকে মোগ্‌গলীপুত্র বলা হতো। মৌদগল্যায়নের জন্মস্থান কোলিত গ্রাম। সে গ্রামের ঐতিহ্যসম্পন্ন কুল বা বংশের পুত্র বলে তাঁর গৃহী নাম ছিল কোলিত। উপতিষ্য ও কোলিত দু'জনেই ছেলেবেলা থেকে পরম বন্ধু ছিলেন। দু'জনে বাস করতেন পাশাপাশি দুটি গ্রামে। তাঁরা প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন।

রাজগৃহের কাছে এক জায়গায় উপতিষ্য ও কোলিত স্ব–স্ব সহচরদেরকে নিয়ে একবার নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। নাট্যাভিনয়ের কোনো একদৃশ্য দেখে তাঁদের মনে বৈরাগ্য ভাব জাগ্রত হয়। তাঁরা সংসার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। তখন তাঁরা নিজেদের রথ ও সহচরদের গৃহাভিমুখে পাঠিয়ে দেন। সন্ন্যাস ব্রত পালনের অভীপ্সা নিয়ে তাঁরা যাত্রা করেন সঞ্জয় বেলট্‌ঠীপুত্রের কাছে । সঞ্জয় বেলট্‌ঠীপুত্র ছিলেন একজন পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ। তাঁর অনেক শিষ্য ছিল। উপতিষ্য ও কোলিত তাঁর কাছে গিয়ে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। অল্প দিনের মধ্যে গুরুর কাছ থেকে সব বিদ্যা শিখে নেন। তাঁরা গুরুকে জিজ্ঞেস করেন, আচার্য, এতে তো পরম মুক্তির কোনো সন্ধান নেই। আমরা এমন কিছু লাভ করতে চাই, যা লাভ করলে বারবার জন্ম দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ ভোগ করতে হবে না। এতে ঋষি সঞ্জয় নীরব থাকেন। সঞ্জয় ছিলেন মূলত বিক্ষেপবাদী। বিক্ষেপবাদীরা সব বিষয়ে ইতস্ততঃ থাকেন। কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। গুরুর অপারগতা দেখে তখন দুই বন্ধু তাঁর অনুমতি নিয়েই মুক্তির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন।

সে সময় বুদ্ধ সারনাথে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' দেশনা করে রাজগৃহের বেণুবন আরামে সশিষ্য বাস করছিলেন। বুদ্ধের শিষ্য অশ্বজিৎ একদিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বের হন। অশ্বজিতের সৌম্য চেহারা ও নিরাসক্তি সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দেখে উপতিষ্য মুগ্ধ হন। অশ্বজিতের কাছে তিনি জিজ্ঞেস করেন, ভন্তে, আপনি কার শিষ্য? আপনার শাস্ত্রা কে? তিনি কোন বাদী?

অশ্বজিৎ বলেন, শাক্যবংশীয় মহাশ্রমণ গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ আমার গুরু। সারিপুত্র তখন বুদ্ধের ধর্মমত জানতে চান। অশ্বজিৎ বলেন, পৃথিবীর সকল ঘটনা ও উৎপত্তির সাথে কারণ নিহিত। কারণ ছাড়া কোনো কিছুই হয় না। বুদ্ধ বলেছেন, সেই কারণেরও নিরোধ আছে। পরম শান্তি নির্বাণ লাভের মাধ্যমেই এই শান্তি অর্জিত হয়। এটিই বুদ্ধের মতবাদ। অতএব বুদ্ধ নির্বাণবাদী।

অশ্বজিতের কাছে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বুদ্ধের ধর্মের সংক্ষিপ্তসার শুনে উপতিষ্য স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। তিনি তাঁর বন্ধু কোলিতের কাছে গিয়ে অশ্বজিতের বক্তব্য তুলে ধরেন।। এতে কোলিতও স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। তখন উপতিষ্য কোলিতকে বললেন, বন্ধু, চলুন আমরা বুদ্ধের কাছে যাই। এ লক্ষ্যে তাঁরা তাঁদের আগের গুরু সঞ্জয়ের কাছে গেলেন। তাঁরা গুরুকে নিয়ে বুদ্ধের কাছে যাবেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু সঞ্জয় যেতে রাজি হলেন না। গুরুর কল্যাণ চিন্তা করে তাঁরা গুরুকে রেখে যেতেও চান না। এভাবে অনেক অনুনয় বিনয়ের পরও সঞ্জয় বুদ্ধের কাছে গেলেন না। সঞ্জয়ের এই আচরণ দেখে তাঁর অনেক শিষ্য উপতিষ্য ও কোলিতের অনুগামী হয়ে বুদ্ধের শরণাপন্ন হলেন। এতে সঞ্জয় অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হলেন।

উপতিষ্য ও কোলিত অনুগামীদের নিয়ে রাজগৃহে বুদ্ধ সান্নিধ্যে পৌঁছলেন। বুদ্ধ দূর থেকে উপতিষ্য ও কোলিতকে দেখে তাঁদের অভিলাষ জ্ঞাত হলেন। তিনি তখন শিষ্যদের ধর্মদেশনা করছিলেন। এ সময় বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের সম্বোধন করে বলেন, ঐ যে উপতিষ্য ও কোলিত নামের দুই বন্ধু এদিকে আসছে তাঁরাই হবে আমার অগ্রশ্রাবক। উপতিষ্য ও কোলিতসহ সকল অনুগামীরাও সেখানে আসন গ্রহণ করলেন। বুদ্ধের ধর্ম দেশনা সমাপ্তির পর সকলে প্রব্রজ্যা গ্রহণে উদ্যোগী হলেন। জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফল বিবেচনা করে বুদ্ধ প্রথমে উপতিষ্য ও কোলিতকে দীক্ষা দিলেন। প্রব্রজিত জীবনে তাঁরা যথাক্রমে সারিপুত্র থের ও মৌদগল্যায়ন থের নামেই সমধিক পরিচিত হন। পরে বুদ্ধ তাঁদের অন্য অনুগামীদেরও প্রব্রজ্যা দান করলেন। বুদ্ধ তাঁদের সকলকে প্রব্রজ্যা দিয়ে ধর্মদেশনা করলেন। প্রব্রজ্যা পরবর্তি সাতদিনে মৌদগল্যায়ন এবং পনের দিনে সারিপুত্র অরহত্ব ফলে উন্নীত হন। এ সময় বুদ্ধ সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নকে তাঁর শির্ষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে 'অগ্রশ্রাবক' পদ প্রদান করেন। এ পদ লাভের জন্য তাঁদেরও জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা ছিল। বুদ্ধের ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে আশিজন মহাশ্রাবক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এ দু'জন ছিলেন অগ্রশ্রাবক।

সারিপুত্র ছিলেন মহাপ্রজ্ঞাবান। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষণগুলো তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারতেন। সারিপুত্রের প্রধান উপদেশ হলো মানুষ মরণশীল। মানুষের যে কোনো সময় মৃত্যু হতে পারে। সে জন্য সব সময় মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকা ভালো। অপার দুঃখে পড়ে বিনাশ হওয়া অনুচিত। সুস্থ শরীরে ধর্মাচরণ সুখকর। দুলর্ভ সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। কারণ সময়ও একবার হারালে আর একবার লাভ করা কঠিন।

মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন ঋদ্ধিশক্তিতে অদ্বিতীয়। ঋদ্ধিশক্তিই ছিল তাঁর অফুরন্ত কর্ম শক্তির উৎস। ঋদ্ধি বলেই তিনি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এ ত্রিভুবন ঘুরে ঘুরে বুদ্ধের ধর্ম প্রচার করতেন। এমন কি নরকে গিয়ে নারকীয় দুঃখ দেখে এসে অন্যদের কাছে উপদেশ দিতেন। এ জন্য তার দেশনা ছিল সব সময় চিত্তগ্রাহী। তাঁর দেশনায় নতুন নতুন বিষয় যেমন উপস্থাপিত হতো তেমনি পরিবেশন করা হতো সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়।

মৌদ্গল্যায়ন অরহত্ব ফলে উন্নীত হয়ে তাঁর অনুগামী ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে তিনি গাথায় বহু বিষয় ব্যক্ত করেন। এতে তাঁর জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতাও নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ভাষিত গাথাগুলোর বিশেষ তিনটির সারমর্ম এখানে তুলে ধরা হলো তিনি বলতেন এ দেহ অস্থি–কঙ্কালময় কুটির সদৃশ মাংসলযুক্ত,নয়শত স্নায়ুদ্বারা সেলাই করা কেশ–লোমাদি দ্বারা দুগন্ধপূর্ণ, দেহের প্রতি ধিক্ কুকুর–শৃগাল কৃমি কূলের আধারভূত এ দেহের প্রতি কেন মমতা করছো, এ দেহ বিষ্ঠাপূর্ণ বস্ত্র সদৃশ.ত্বকাবৃত, বক্ষজাত ভীষণ পিশাচ সদৃশ তোমার শরীরের নয়টি দ্বার দিয়ে দিন রাত অশুচি নির্গমণ হচ্ছে। পবিত্রকামীগণ যেন এ বিষ্ঠা দেখে এড়িয়ে চলে, অনুরূপ ভিক্ষুও এই অশুচিপূর্ণ দেহকে বর্জন করে।

সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন এ দুই অগ্রশ্রাবকই বুদ্ধের পূর্বে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন। সারিপুত্রের পরিনির্বাণের পনের দিন পর পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন মৌদগল্যায়ন। অরহত্ব ফলে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে তাঁরা তাঁদের মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই পরিনির্বাণের পূর্বে যথাসময়ে তাঁরা বুদ্ধকে বন্দনা করে যথাপোযুক্ত স্থানে পরিনির্বাণের অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। সারিপুত্র থের নির্বাণপ্রাপ্ত হন নিজ জন্মস্থানে মাতৃ গৃহে। মৌদগল্যায়ন থের পূর্ব জন্মের কৃতকর্মের ফলে কালশৈল পর্বতে ঘাতক কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করেন। কারণ অতীত জন্মে তিনি তাঁর স্ত্রীর প্ররোচনায় বয়োবৃদ্ধ অন্ধ পিতামাতাকে গভীর বনে জন্তু–জানোয়রের সামনে মৃত্যুর মুখে ফেলে এসেছিলেন। ঐ পাপ কর্মের পরিণতিতে তাঁকেও এভাবে মৃত্যু বরণ করতে হলো। মৌদ্‌গল্যায়নের পবিত্র দেহধাতু বুদ্ধের নির্দেশে বেণুবন বিহারের পূর্বদ্বারে রাখা হয়। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক তথাগত বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে সারিপুত্রের দেহভস্মের ওপর শ্রাবস্তীতে এক স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। এই দুই অগ্রশ্রাবক দীর্ঘকাল বুদ্ধবাণীর বিকাশ সাধন করে তাঁদের কর্ম ও কৃতিত্বের জন্য অমর হয়ে আছেন।

বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নের জীবনচরিত পাঠে আমরা জানতে পারি যে একাগ্রতা ও অধ্যাবসায় থাকলে অবশ্যই মানুষ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে। ভালো বা মন্দ কর্মের জন্য যথাপোযুক্ত ফল রয়েছে। যেমন মৌদ্‌গল্যায়নকে ঘাতকের হাতে মৃত্যু বরণ করতে হলো। তাই গোপনে বা কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কখনই কোনো মন্দ কাজ করা উচিত নয়।

সারসংক্ষেপ :

বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্র ও মৌদ্‌গলায়ন ছিলেন দুই দিকপাল ভিক্ষু। তাঁরা ছিলেন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক। সারিপুত্র ছিলেন অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্পন্ন মহাপ্রজ্ঞাবান ভিক্ষু। মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন ঋদ্ধিশক্তির সম্পন্ন মহাসাধক। এ দুই শিষ্য তাঁদের কর্ম ও কৃতিত্বের জন্য বৌদ্ধ ইতিহাস অমর হয়ে আছেন। তাঁদের জীবন চরিত পাঠে জানা যায় যে - একাগ্রতা ও অধ্যবসায় থাকলে অবশ্যই যে কোনো মানুষ অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছুতে পারে। এরূপ মহৎ, প্রজ্ঞাবান ও ত্যাগী মানুষদের জীবনচরিত পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সারিপুত্রের গৃহী নাম কী ছিল?
- ক. সঞ্জয়
- খ. সারি
- গ. কোলিত
- ঘ. উপতিষ্য

২। সারিপুত্রের গ্রামের নাম কী ?
- ক. নালন্দা গ্রাম
- খ. নালক গ্রাম
- গ. নোলক গ্রাম
- ঘ. কোলিক গ্রাম

৩। বুদ্ধ সারনাথে কোন সূত্র দেসনা করেছিলেন। ?
- ক. ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র বুদ্ধগণ
- খ. মঙ্গল সূত্র
- গ. জ্ঞান সূত্র
- ঘ. প্রজ্ঞা সূত্র

৪। ঋদ্ধিশক্তিতে কে অদ্বিতীয় ছিলেন ?
- ক. মৌদগল্যায়ন
- খ. সারিপুত্র
- গ. ব্রাহ্মণী পুত্র
- ঘ. সঞ্চয় পুত্র

উত্তরমালা : ১. ঘ, ২. খ, ৩. ক, ৪. ক

পাঠ-১২.৩ পূর্ণিকা থেরী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পূর্ণিকা থেরীর জন্ম ও কর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ণিকা থেরীর ত্যাগের অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পূর্ণিকা থেরী, উদকশুদ্ধিক ব্রাহ্মণ, পাপমল পরিশোধন, স্নানশুদ্ধি, সৎচেতনা ও সুকর্ম।

পূর্ণিকা থেরী

পূর্ণিকা রাজগৃহের এক ধনী শ্রেষ্ঠীর পরিচারিকা ছিলেন। একদিন শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে এক ভোজের আয়োজন হয়। ঘরে বিশেষ কোনো আয়োজন হলেই দাসদাসীদের কাজ বেড়ে যায়। পূর্ণিকার ওপর পড়ল ধান ভানার কাজ। কিন্তু দিনের মধ্যে কাজ শেষ হলো না। তাই তিনি রাতেও কাজ করতে লাগলেন। একটানা পরিশ্রমের পর বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রেষ্ঠীর বাড়ির সামনেই ছিল একটি বৌদ্ধ বিহার। সেখানে তখন বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ধ্যানরত ছিলেন। বিহারের কক্ষগুলোতে রাতেও মিটমিট আলো জ্বলছে। পূর্ণিকা ভাবলেন, এত রাত পর্যন্ত বিহারে আলো জ্বলছে কেন? ভিক্ষুরা তো গৃহত্যাগী। তাঁদের এত কাজ কিসের ? এসব কথা ভাবতে ভাবতে রাত ভোর হয়ে গেল।

পূর্ণিকা প্রতিদিন ভোরে স্নান করেন, আজকেও তিনি স্নান করতে যাবেন। বাকি কাজটুকু স্নান করে এসে করবেন। রান্নাঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন একটা পাত্রে কিছু লাল আটা পড়ে আছে। পূর্ণিকা সেই আটা দিয়ে কয়েকটা রুটি তৈরি করলেন। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে রুটিগুলো পোড়া পোড়া হয়ে গেল। ভাবলেন, স্নান করে সেগুলো ঘাটে বসে খাবেন।

তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে। নদীর ঘাটে পূর্ণিকা একা। স্নানও শেষ। এমন সময় দেখলেন স্বয়ং বুদ্ধ সশিষ্য ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বের হয়েছেন। ভিক্ষাপাত্র হাতে সকলে এগিয়ে আসছেন। । বুদ্ধের পিছনে সেবক আনন্দ ও অন্যান্য ভিক্ষু। বুদ্ধকে দেখে পূর্ণিকার মন আনন্দে ভরে ওঠল। একবার প্রাণভরে বন্দনা করার খুব ইচ্ছা জাগল।

ততক্ষণে বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হাতে সামনে এসে গেছেন। পূর্ণিকা মুখ তুলে তাকালেন। বুদ্ধের সৌম্য চেহারা দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। তারপর মনের সমস্ত সাহস এক করে বুদ্ধের পাত্রে পোড়া রুটিগুলো দান করলেন। ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে বললেন, প্রভু আমি ক্রীতদাসী। এই সামান্য দান গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন।

বুদ্ধ সবকিছু জানেন। তিনি পূর্ণিকার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন মা, তোমার দান গ্রহণ করলাম। ভক্তির দান সামান্য হলেও মহামূল্যবান। তুমি মনে কষ্ট নিওনা। বুদ্ধ নদীর ধারে এক গাছের নিচে বসলেন। শিষ্যদের নিয়ে সেই পোড়া রুটি তৃপ্তি ভরে খেলেন। এ দৃশ্য দেখে পূর্ণিকার চোখ জলে ভরে গেল। তখন বুদ্ধের কাছে গিয়ে পূর্ণিকা ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলেন, প্রভু! গভীর রাতে দেখলাম বিহারে আলো জ্বলছে। আপনারা সংসারত্যাগী, আপনাদের কোন ঝামেলা নেই। তবুও আপনাদের চোখে ঘুম আসে না কেন? বুদ্ধ বললেন, রাত জেগে আমরা ধ্যান করি।

রাতে ধ্যান করা ভিক্ষুদের একটি নৈমিত্তিক কাজ। ধ্যানে তৃষ্ণা ক্ষয় হয়। বুদ্ধের এই অমৃতবাণী শুনে পূর্ণিকার মন থেকে সংশয় দূর হয়ে গেল। বুদ্ধ পূর্ণিকার মনোবাসনা উপলব্ধি করে তাকে দেশনা দিলেন। এতে পূর্ণিকা শ্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হলো।

বুদ্ধ দর্শনের পর হতে পূর্ণিকার চিন্তা চেতনার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। সর্বদা পরোপকার ও সেবা করার প্রতি তাঁর আগ্রহ বেড়ে ওঠে। এ সময় একদিন নদীতে স্নানে গিয়ে এক উদকশুদ্ধিক ব্রাহ্মণের সাথে তাঁর দেখা হয়। উদকশুদ্ধিক মানে পানিতে ভিজে জীবন শুদ্ধ করার ব্রতধারি। সে ব্রাহ্মণ শীতের ভোরে নদীর পানিতে ডুবে ছিল। পূর্ণিকা জিজ্ঞেস করে জানলেন তিনি আজীবনের পাপমল পরিশোধনের জন্য এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। তখন পূর্ণিকা বললেন, স্নানশুদ্ধি দ্বারা পাপ মুক্তি ঘটলে নদীর ব্যাঙ, কচ্ছপ, মাছ, সাপ ও কুমিরগুলোর স্বর্গ লাভ নিশ্চিত। সেই সাথে প্রাণী হত্যাকারী, চোর, ডাকাত ও খুনিরাও ''স্নানশুদ্ধি দ্বারা পাপ মুক্ত হয়ে যেতো। এছাড়া নদীর পানিতে যদি পাপ ধুয়ে যায় , তাহলেতো পুণ্যও ধুয়ে যেতে পারে।'' এ কথা শুনে ব্রাহ্মণের বিবেক জাগ্রত হলো। ব্রাহ্মণ বুঝতে সক্ষম হলেন যে, তিনি ভুল পথে চলছেন। সত্য পথে আনয়নের জন্য ব্রাহ্মণ পূর্ণিকাকে অনেক নতুন বস্ত্র উপহার দিতে চাইলেন। পূর্ণিকা উপহার নিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন, প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে পাপকর্ম থেকে বিরত হয়ে জীবন পরিচালিত করুন। পূর্ণিকা কর্তৃক উদকশুদ্ধিক ব্রাহ্মণ সৎ পথ লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, একথা চতুর্দিক প্রচার হয়ে গেলো। পূর্ণিকার গৃহকর্তাও একথা শুনলেন। তিনি খুব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি আনন্দ চিত্তে পূর্ণিকাকে দাসী কর্ম থেকে মুক্তি দিলেন। পূর্ণিকা মুক্তি পেয়ে ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা নিলেন। তারপর তিনি বিদর্শন ভাবনা অভ্যাস করে অর্হত্ত্ব ফল লাভ করলেন।

একজন সামান্য ক্রীতদাসীও যে সৎ চেতনা ও সুকর্মের প্রভাবে জগতে খ্যাতি লাভ করতে পারে সে ধারণা আমরা এখানে পাই। এছাড়া অধ্যবসায় ও সাধনার বলে নারীরাও যে অর্হৎ হতে পারেন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ পূর্ণিকা থেরী।

সারসংক্ষেপ :

পূর্ণিকা একজন সাধারণ পরিচারিকা হলেও তার হৃদয় ত্যাগ ও মৈত্রীতে পরিপূর্ণ ছিল। বিশেষতঃ দান চেতনা তার মধ্যে গভীরভাবে বিরাজমান ছিল। কিন্তু তাঁর এরূপ চিত্তানুভূতি প্রকাশের কোন সুযোগ ছিলনা। তাই একদিন নদীতে স্নান করতে গিয়ে বুদ্ধকে ভিক্ষাপাত্র হাতে সশিষ্য ভিক্ষান্ন সংগ্রহে আসতে দেখার সুযোগ লাভ করে পূর্ণিকা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। একই সাথে তিনি চিন্তায় বিভোর হলেন কী দান দেবেন বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রে। শেষে তাঁর এক মাত্র সম্বল দুটি পোড়া রুটি বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রে শ্রদ্ধাচিত্তে দান করলেন। বুদ্ধ সে দান গ্রহণ করলেন। সেই সাথে পূর্ণিকার শ্রদ্ধা ভক্তি দেখে দেশনা প্রদান করেন। বুদ্ধের দেশনা শ্রবণ পূর্ণিকার চিন্তা-চেতনার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় । সেই চেতনার আলোকে একদিন এক উদকশুদ্ধিক ব্রাহ্মণকে সঠিক সাধন পথে আনয়ন করেন। একজন সামান্য ক্রীতদাসীও যে সৎ চেতনা ও সুকর্মের প্রভাবে জগতে খ্যাতি লাভ করতে পারে সে উদাহরণ পূর্ণিকা থেরীর জীবনে প্রতিভাত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পূর্ণিকা বুদ্ধকে কী দান করেছিলেন ?

ক. ভেজা রুটি খ. সুস্বাধু খাদ্য

গ. পোড়া রুটি ঘ. সুপেয় পানি

২। উদকশুদ্ধিক মানে পানিতে ভিজে জীবন ..

ক. যুদ্ধ করার ব্রতধারি খ. নষ্ট করার ব্রতধারি

গ. দান করার ব্রতধারি
ঘ. শুদ্ধ করার ব্রতধারি

৩। পূর্ণিকা দাসী কর্ম থেকে মুক্তি পেয়ে কী করলেন ?
ক. গৃহী কর্মে দীক্ষা নিলেন
খ. ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষা নিলেন
গ. সমাজ সেবায় দীক্ষা নিলেন
ঘ. শ্রমণ ধর্মে দীক্ষা নিলেন

উত্তরমালা : ১. গ, ২. ঘ, ৩. খ

পাঠ-১২.৪ বিশাখা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিশাখা কে ছিলেন বলতে পারবেন।
- বিশাখার পৈত্রিক পরিচয় বলতে পারবেন।
- বিশাখার আদর্শ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বৌদ্ধধর্ম ও ভিক্ষু সংঘের কল্যাণে বিশাখার অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বিশাখা, মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী, ভদ্দিয়নগর, দশটি উপদেশ, মিগার শ্রেষ্ঠী, পুন্যধর্বন, শ্রদ্ধাচিত্ত, মহাউপাসিকা, পূর্বারাম, আটটি বর।

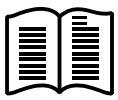

বিশাখা

বুদ্ধের সময় অঙ্গ রাজ্যের ভদ্দিয় নগরে ধন ও যশ খ্যাতি সম্পন্ন একজন উপাসক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী। ধনঞ্জয় নামে তাঁর এক পুত্র ছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত বিত্ত বৈভব ও বংশ মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। দান, ধর্ম ও সেবা এ বংশের অন্যতম ঐতিহ্য ছিল। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর সহধর্মিনীর নাম সুমনাদেবী। তাঁদেরই কোল আলো করে জন্ম নিয়েছিলেন বিশাখা। ছোটকাল থেকে বিশাখা অত্যন্ত উদার ও মানবিক প্রকৃতির ছিলেন। দান ও বিবিধ কল্যাণকর্মের জন্য বিশাখা অনন্য খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর কর্মের খ্যাতিতে বৌদ্ধ জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বিশাখার বয়স যখন সাত বছর তখনই তাঁর সৌভাগ্য হয় বুদ্ধ দর্শনের। এ সময় সেল নামক এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর অনুগামী প্রায় তিন শতাধিক শিষ্যকে দীক্ষা প্রদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বুদ্ধ সশিষ্যসহ ভদ্দিয় নগরে এসেছিলেন। বুদ্ধের আগমন উপলক্ষে বিশাখার পিতামহ মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী বিশাখাকে নিয়ে বুদ্ধ দর্শনে গিয়েছিলেন। বিশাখার সাথে ছিল পাঁচশত সখী, পাঁচশত পরিচারিকা এবং পাঁচশত সুসজ্জিত রথ। বিশাখার সুযোগ হয় বুদ্ধকে কাছে গিয়ে বন্দনা করার। বুদ্ধ বিশাখার পূর্ব জন্মার্জিত পারমীগুণ অবগত হয়ে সে অনুসারে ধর্ম দেশনা করেন। সকলে গভীর শ্রদ্ধাচিত্তে বুদ্ধভাষণ শ্রবণ করেন। বুদ্ধের ধর্ম দেশনার সমাপ্তিতে পাঁচশত সখীসহ বিশাখা এবং মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী স্রোতাপত্তি ফলে উন্নীত হন। মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী শ্রদ্ধাবনত হয়ে বুদ্ধকে ভিক্ষুসংঘসহ পরদিন তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। বুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। পরদিন যথাসময়ে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী নিজগৃহে উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করলেন। পরে বুদ্ধের দেশনা শ্রবণ করলেন। এতে বিশাখাসহ মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী পরিবারের সদস্যরা অপার আনন্দ অনুভব করলেন। এ সময় তাঁরা বুদ্ধকে ভিক্ষুসংঘসহ আরও পনের দিনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করার অনুরোধ জানালেন। বুদ্ধ তাঁদের শ্রদ্ধা ভক্তি দেখে সম্মতি প্রদান করেন। এতে বিশাখার সদ্ধর্মচর্চার এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বয়সের ধারাবাহিকতায় বিশাখা বিবাহযোগ্যা হয়ে ওঠেন। পিতামাতা তাঁর বিয়ের জন্য তৎপর হলেন। সে সময় শ্রাবস্তীতে মিগার নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম পুণ্যবর্ধন। পুণ্যবর্ধনের সঙ্গে বিশাখার বিয়ে হয়। বিশাখার বাবা বিশাখাকে বহু দাসদাসী, রথ ও মহামূল্য মণিমুক্তা উপহার দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পাঠান। শ্বশুরালয়ে পরস্পর শান্তি, সম্প্রীতি ও কল্যাণকর পরিবেশে বসবাসের জন্য বিশাখার পিতা বিশাখাকে দশটি উপদেশ প্রদান করেন। এ দশটি উপদেশ সর্বজনীন উপদেশ হিসেবে স্বীকৃত হয়। এ দশটি উপদেশ হলো :-

১. ঘরের আগুন বাহরে নিয়ো না। অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির কারো দোষ দেখলে বাইরের কাউকে বলবে না।

২. বাইরের আগুন ঘরে এনো না। অর্থাৎ প্রতিবেশী কেউ শ্বশুরবাড়ির কারো দোষের কথা বললে তা তোমার শ্বশুরবাড়ির কারো কাছে প্রকাশ করো না।
৩. যে দেয় তাকে দেবে। অর্থাৎ কেউ কিছু ধার নিয়ে ফেরত দিলে তাকে ধার দেবে।
৪. যে দেয় না তাকে দিয়ো না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কিছু ধার নিয়ে ফেরত দেয় না তাকে দিয়ো না।
৫. যে দেয় অথবা না দেয় তাকেও দেবে। অর্থাৎ কোনো আত্মীয় গরিব হলে, ধার নিয়ে ফেরত দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলেও থাকে ধার দিয়ো।
৬. সুখে আহার করবে। অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির গুরুজনদের খাওয়া শেষ হলে অন্যদের খাওয়া সম্পর্কে খবর নিয়ে তারপর আহার গ্রহণ করবে।
৭. সুখে উপবেশন । অর্থাৎ এমন স্থানে বসবে যে স্থান থেকে গুরুজনদের দেখে ওঠতে না হয়।
৮. সুখে শয়ন করবে। অর্থাৎ যাবতীয় গৃহকর্ম সমাধা করে গুরুজনদের শয়নের পর শয়ন করবে।
৯. অগ্নির পরিচর্যা করবে। অর্থাৎ গুরুজন ও ছোটদের সচেতনতার সাথে প্রয়োজনীয় সেবা শ্রশ্রুষা করবে।
১০. শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদের দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করবে।

উপরি-উক্ত উপদেশনমূহ বিবাহ অনুষ্ঠানসহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে আজও অন্যতম উদাহরণ হিসেবে উচ্চারণ করা হয়। পারিবারিক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে এগুলোর উপযোগিতা অপরিসীম।

বিশাখার শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠী এ বিয়েতে সাত দিনব্যাপী উৎসব পালন করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিতসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ বিয়েতে যোগদান করেছিলেন।

বিশাখা শ্বশুরালয়ের সমস্ত কাজ নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করার চেষ্টা করতেন। এতে শ্বশুর–শ্বাশুড়িও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। মিগার শ্রেষ্ঠী ছিলেন কিছু ভ্রান্তধারার অনুসারী সন্ন্যাসীর ভক্ত। এ সন্ন্যাসীরা বিবস্ত্র থাকতেন। মিগার শ্রেষ্ঠীর গৃহে তাঁরা প্রায় আসতেন। একদিন গুরুপূজা উপলক্ষে মিগার শ্রেষ্ঠী বিশাখাকে তাঁদের সামনে নিয়ে যান। বিশাখা দেখলেন গুরুগণ সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। বিশাখা এতে বিরক্তি প্রকাশ করেন। সন্ন্যাসীরা বিশাখার ভাব বুঝতে পারেন। তাঁরা শ্রেষ্ঠীকে বললেন, এই রমণী গৌতমের শিষ্যা, একে ঘর থেকে বের করে দাও। তা না হলে তোমার সর্বনাশ হবে। এতে শ্রেষ্ঠী চিন্তিত হলেন।

একদিন মিগার শ্রেষ্ঠী মহাপালঙ্কে বসে নির্জলা মধুপায়েস খাচ্ছিলেন। এমন সময় এক পিণ্ডাচারি বৌদ্ধভিক্ষু মিগার শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে ভিক্ষার জন্য আসেন। শ্রেষ্ঠী তাঁকে দেখেও কোনো কিছু দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। শ্বশুরের অনুমতি ছাড়া বিশাখার পক্ষেও দেয়া সম্ভব নয়। তখন বিশাখা আগন্তুক ভিক্ষুকে বললেন, ভন্তে, আপনি অন্যত্র যান। আমার শ্বশুর বাসি খাবার খাচ্ছেন। মিগার শ্রেষ্ঠী একথা শুনে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হলেন। বিশাখাকে বললেন, তুমি এ বাড়ি থেকে চলে যাও। দাস–দাসীদের আদেশ দিলেন বিশাখাকে বিদায় করতে। কিন্তু বাড়ির অন্তপুরের সকলেই ছিল বিশাখার ভক্ত। একথা শুনে বিশাখা বললেন, আমি ক্রীতদাসী নই, আমাকে ইচ্ছা করলে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁদের বিচারে দোষী হলে আমি চলে যাব। অপবাদেও বোঝা মাথায় নিয়ে আমি শ্বশুরালয় ত্যাগ করবো না। ক্রুদ্ধ হয়ে মিগার শ্রেষ্ঠী তাঁদের আহবান করলেন। তাঁরা এলে বিশাখা বললেন, আমার শ্বশুর 'বাসি' খাবার খাচ্ছেন বলার অর্থ এই যে, তিনি পুর্বজন্মের পুণ্যফলের প্রভাবে অর্জন করা খাবার খাচ্ছেন। বিষয়টি তিনি বুঝিয়ে বললেন নীতি বিজ্ঞবানদের বিচারে বিশাখার জয় হয়।

একদিন বিশাখা বুদ্ধসহ ভিক্ষুসঙ্ঘকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধ সশিষ্য মিগার শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে যাচ্ছেন এ খবর পেয়ে বিবস্ত্র সন্ন্যাসীরাও এসে বাড়ির বাইরে অবস্থান নেন। তাঁদের শঙ্কা মিগার শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের দীক্ষা নিলে তারা দান দক্ষিণা থেকে বঞ্চিত হবেন। এ ভয়ে তাঁরা মিগার শ্রেষ্ঠীকে ভিক্ষুদের সাথে দেখা করতে নিষেধ করেন। মিগার শ্রেষ্ঠীও ভিক্ষুদের দেখে নিজের কক্ষে বসে রইলেন। বিশাখা যাবতীয় দান সাজিয়ে শ্বশুরকে ডাকলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠী বিবস্ত্র সন্ন্যাসীদের কথা মত দান কাজ শেষ করতে বলেন। বিশাখা সশ্রদ্ধ চিত্তে বুদ্ধসহ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন। দানকর্ম সম্পন্ন হলে বিশাখা ধর্মকথা শুনতে শ্বশুরকে আহবান করেন। শ্রেষ্ঠী তখন ভাবলেন, এখন না গেলে খুব অভদ্রতা হবে। এরূপ চিন্তা করে তিনি যেতে

উদ্যত হলেন। এ সময় বিবস্ত্র সন্ন্যাসীরা বললেন, শ্রমণ গৌতমের ধর্ম শুনলে পর্দার আড়াল থেকে শুনবে। কারণ এই সন্ন্যাসীরা মনে করতেন বুদ্ধের মায়াবী ক্ষমতা আছে। সেই মায়ার বলে মিগার শ্রেষ্ঠীকে মুগ্ধ করে তাঁর শিষ্য করে নেবেন।

সন্ন্যাসীদের নির্দেশ মতো মিগার শ্রেষ্ঠী পর্দার আড়ালে গিয়ে বসলেন। বুদ্ধ বললেন, শ্রেষ্ঠী আপনি পর্দার অন্তরালে, প্রাচীরের অন্তরালে, পাহাড়ের অন্তরালে অথবা দিক চক্রবালের অন্তরালে যেখানেই বসুন না কেন, আমার শব্দ সর্বত্র ঘোষিত হবে। এই বলে মহাকারুণিক বুদ্ধ ধর্মদেশনা শুরু করলেন। প্রথমে শ্রেষ্ঠীর আগ্রহ না থাকলেও ক্রমে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েন। বুদ্ধের দেশনা শেষ হলে শ্রেষ্ঠী স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। তারপর তিনি বুদ্ধের সামনেই পুত্রবধু বিশাখাকে 'জ্ঞানদায়িনী মাতা' বলে সম্বোধন করে বললেন, মা তুমি এতদিনে এ সন্তানকে উদ্ধার করলে। সে থেকে বিশাখাকে 'মিগারমাতা'নামে অভিহিত করা হয়।

এরপর হতে মিগার শ্রেষ্ঠীর গৃহে বিশাখার উদ্যোগে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিত্য মর্ধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রেষ্ঠী নিজেও বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। বিশাখা আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে শ্রাবস্তীতে একটি বিশাল বিহার নিমার্ণ করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেছিলেন। এটিকে বলা হয় পূর্বারাম বিহার। এ বিহার নির্মাণ কাজে তদারকি করার জন্য বিশাখা বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক মহামৌদ্গল্যায়নের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন। মহামৌদ্গল্যায়ন পাঁচশত শিষ্যসহ এতে সহায়তা করেছিলেন। কথিত আছে মহামৌদ্গল্যায়ন নিজের ঋদ্ধিশক্তি প্রভাবে মাত্র নয় মাসে বিহার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে ছিলেন। দ্বিতল বিশিষ্ট এ বিহারের কক্ষের সংখ্যা ছিল এক হাজার। প্রত্যেকটি কক্ষ বিশাখা নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। এ বিহার দানোৎসব চলেছিল চার মাসব্যাপী। এর জন্য বিশাখাকে আরও নয় কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করতে হয়েছিল। বুদ্ধ পূর্বারাম বিহারে বিভিন্ন সময়ে ছয় বর্ষাবাসব্রত পালন করেছিলেন। এ সময় বিশাখা নিত্যকর্মের মতো প্রতিদিন তিনবার খাদ্য ভোজ্য, মালা ও ধূপ ইত্যাদি নিয়ে বিহারে যেতেন। । এক সময় বিশাখা বুদ্ধের কাছে আটটি বর প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তা অনুমোদন করে ছিলেন। সেগুলো হলো-

১. বিশাখা আজীবন বুদ্ধের কাছে আগত যে কোনো অতিথি ভিক্ষুর আহার্য দান করবেন।
২. বিশাখা আজীবন ভিক্ষুসংঘকে স্নানবস্ত্র প্রদান করবেন। ।
৩. বিশাখা আজীবন বিহার হতে বহির্গামী ভিক্ষুদের আহার্য দান করবেন।
৪. বিশাখা আজীবন অসুস্থ ভিক্ষুর যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৫. বিশাখা আজীবন অসুস্থ ভিক্ষুদের পরিচর্যাকারীদেরও আহার্য দান করবেন।
৬. বিশাখা আজীবন বিহারের অসুস্থ ভিক্ষুদের জন্য প্রয়োজনীয় পথ্য সরবরাহ করবেন।
৭. বিশাখা আজীবন ভিক্ষুদের যাগু–অন্ন দান করবেন।
৮. বিশাখা আজীবন ভিক্ষুণীদের স্নানবস্ত্র প্রদান করবেন।

বিশাখার উল্লিখিত বর প্রার্থনার মধ্যে তাঁর গভীর দান চেতনা ও উদারতার প্রকাশ ঘটেছে। এরপর হতে বিশাখা সানন্দে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবায় নিয়োজিত হয়ে অপরিসীম পুণ্য সঞ্চয় করেন। বিশাখার বাড়িতে প্রত্যেহ পাঁচশত ভিক্ষু আহার গ্রহণ করতেন। বিশাখার ১০জন পুত্র ও ১০জন কন্যা ছিল। তাঁদের প্রত্যেকেরও ১০টি করে সন্তান ছিল। এভাবে তাঁরা সবাই বলশালী ও সম্পদশালী হয়ে সুখে ছিলেন। বিশাখা 'মহা উপাসিকা' নামে খ্যাত ছিলেন। এ মহাউপাসিকার জীবনী হতে 'ত্যাগই মানুষকে মহৎ ও মহান করে, ভোগে নয়' এ শিক্ষা পাই। যে কোনো পরিস্থিতিতে আদর্শচ্যুত হওয়া উচিত নয়। নৈতিক আদর্শ মানুষকে মর্যাদাবান করে। এতে নারী–পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নাই, কোনো বাধাও নাই। শুধু অন্তরের সদিচ্ছাই প্রয়োজন।

সারসংক্ষেপ :

বৌদ্ধধর্মে ইতিহাসে চির স্মরণীয় একটি নাম বিশাখা। তাঁর জন্ম অঙ্গ রাজ্যের ভদ্দিয় নগরের এক ধনাঢ্য পরিবারে। তাঁর পিতা মাতা ছিলেন ধন সম্পদ ও জ্ঞানে গুণে খ্যাতি সম্পন্ন। দান ধর্মে তাঁর পিতা ধনঞ্জয় ও মা সুমনাদেবীর সুখ্যাতি ছিল। এই পৈত্রিক ঐতিহ্য বিশাখার বড় পরিচয় নয়। জীবনে তিনি আপন গুণপনায় সকলকে মুগ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দান ও ত্যাগের মাধ্যমে তিনি মহিমান্বিত হয়েছেন। সত্য, সুন্দর ও ধর্মাদর্শের অনুশীলনে তিনি সর্বদা তৎপর ছিলেন। তাঁর নিরাহংকার নির্মোহ উদার দানশীলতার জন্য তিনি 'মহাউপাসিকা' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। এটি শুধু একজন নারী হিসেবে নয়। সর্বজনীন ইতিহাসে ও এটি অনন্য উদাহরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কত বছর বয়সে বিশাখার বুদ্ধ দর্শনের সৌভাগ্য হয় ?

ক. পাঁচ বছর খ. ছয় বছর

গ. সাত বছর ঘ. আট বছর

২। পিতা বিশাখাকে কয়টি উপদেশ প্রদান করেছিলেন ?

ক. সাতটি উপদেশ খ. দশটি উপদেশ

গ. পনেরটি উপদেশ ঘ. বিশটি উপদেশ

৩। পর্দার আড়ালে বসে কে বুদ্ধের দেশনা শুনছিলেন ?

ক. মিগার শ্রেষ্ঠী খ. মাগন্দিয়া শ্রেষ্ঠী

গ. মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী ঘ. ধণঞ্জয় শ্রেষ্ঠী

৪। বিশাখা বুদ্ধের কাছে কয়টি বর প্রার্থনা করেছিলেন ?

ক. পাঁচটি বর খ. ছয়টি বর

গ. সাতটি বর ঘ. আটটি বর

উত্তরমালা : ১. গ, ২. খ, ৩. ক, ৪. ঘ

পাঠ-১২.৫ থেরী কিসা গৌতমী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃশা গৌতমী থেরীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কৃশা গৌতমী থেরী কীভাবে জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন সে সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কৃশা গৌতমী, পুত্র শোক, মৃত্যু অনিবার্য, পদুমুত্তর বুদ্ধ, হংসবতীনগর, পরম সত্য উপলব্ধি।

কৃশা গৌতমী একজন শ্রদ্ধাসম্পন্না নারী। পালি সাহিত্যে তিনি 'কিসা গৌতমী' নামে খ্যাত। গৌতমবুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করে তিনি গভীরভাবে ধর্মানুরাগী হয়। পরে বুদ্ধের ভিক্ষুণীসংঘে দীক্ষা গ্রহণ করে মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করে। তিনি শ্রাবস্তী নগরে এক দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল গৌতমী। তাঁর দেহ অত্যন্ত কৃশকায় হওয়ায় তিনি কৃশাগৌতমী নামে অভিহিত হয়েছিলেন। তার বিবাহিত জীবনে তিনি সুখ লাভ করতে পারে নি। অনাদর অবহেলায় কেটেছে তার জীবন। অসময়ে স্বামীরও মৃত্যু হয়েছে। লোকে তাঁকে অনাথা বলত। কিন্তু এক পুত্র সন্তান প্রসব করে তিনি সম্মান লাভ করেন। পুত্রটিই ছিল তার সকল আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। পুত্রটি বড় হয়ে ক্রমে কৈশোরে উত্তীর্ণ হলো। ঐ সময় হঠাৎ তার মৃত্যু হয়। এতে শোকে উদ্‌ভ্রান্ত হলেন কৃশা গৌতমী। একমাত্র পুত্রের মৃত্যু তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। সন্তানের মৃতদেহ কোলে নিয়ে উন্মাদিনী হয়ে তিনি মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলেন। সকলের কাছে মৃত সন্তানকে বাঁচানোর জন্য ঔষধ ভিক্ষা চাইলেন। সে ঔষধ কেউ দিতে পারলেন না। বরং নগরবাসী তাকে কেউ পাগল বললেন , কেউ জানালেন ধিক্কার। কৃশা গৌতমী কারো কথাতেই ভ্রুচক্ষেপ করলেন না। সন্তান হারা মা কৃশা গৌতমী ছুটে চললেন প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে। অবশেষে এক মহৎ ব্যক্তি তাকে বললেন তথাগত বুদ্ধের কাছে গিয়ে ঔষধ প্রার্থনা করতে।

তথাগত বুদ্ধ প্রতিদিনের মত তাঁর শিষ্যদের ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন। এমন সময় মৃত সন্তান কোলে কৃশা গৌতমী সেখানে উপস্থিত হলেন। বললেন 'ভগবান! আমার সন্তানের জন্য ঔষধ দিন। বুদ্ধ কৃশা গৌতমীকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি ধ্যান চেতনায় দেখলেন কৃশা গৌতমীর পূর্ব জন্মের সুকৃতি আছে কিন্তু এ জন্মের নানাবিধ কর্ম ও কর্মফলে তার হৃদয় বিধ্বস্ত। বুদ্ধ তার মানসিক অশান্তি প্রশমনে তাকে বললেন ' নগরে গিয়ে এমন একটি ঘর থেকে শষ্যবীজ নিয়ে এসো যে ঘরে কখনো কোন মানুষের মৃত্যু হয় নি। কৃশা গৌতমী সম্মতি জ্ঞাপন করে ব্যাকুল হয়ে নগরের প্রতিটি ঘরের দরজায় গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কোথাও এমন একটি ঘর পাওয়া যায় নি যে ঘরে কখনো কোন মানুষের মৃত্যু হয় নি। অবশেষে তিনি উপলব্ধি করলেন কোন ঘরই মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রেহাই পায় নি। তিনি বুঝতে সমর্থ হলেন জন্মের সাথে মৃত্যু একই সূত্রে গাথা। জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য। এ মৃত্যু সময়েও হতে পারে , অসময়েও হতে পারে। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট কাল নোই।

এ বোধ থেকে কৃশা গৌতমী মৃত সন্তানকে নগরের বাইরে শ্মশানে নিয়ে গেলেন। মৃত পুত্রের যথাপোযুক্ত সৎকার করলেন। পরে তিনি বুদ্ধের কাছে গিয়ে তার মানসিক পরিবর্তনের কথা জানালেন। বুদ্ধ বললেন ''জগতের সকল বস্তুই অনিত্য। জন্ম হলেই মৃত্যু অবধারিত। এই নিয়ম সকল জীবসত্ত্বার জন্য প্রযোজ্য। এই পরম সত্য বুঝতে না পারার জন্যই মানুষের দুঃখ হয়।'' বুদ্ধ তখন কৃশা গৌতমীকে চারি আর্যসত্য ও আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ দেশনা করে বললেন ''দুঃখের স্বরূপ অবগত হও, তার উৎপত্তি, নিরোধ এবং নিরোধের উপায় অষ্টাঙ্গিকমার্গসহ চতুর্বিধ সত্যে জ্ঞান লাভ কর। বুদ্ধের দেশনা

শুনতে শুনতে কৃশা গৌতমী স্রোতাপত্তি ধ্যান স্তরে উন্নীত হলেন। তিনি ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষা প্রার্থি হলেন। ভিক্ষুণী জীবন লাভ করে গভীর ধ্যানচর্চার ফলে তিনি সকল আকাঙ্ক্ষা ক্ষয় করে অরহত্বে উন্নীত হলেন। এ সময় অন্তর্দৃষ্টি জ্ঞানে তিনি তাঁর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে জানতে সক্ষম হলেন। এ জ্ঞানে তিনি দেখলেন পদুমুত্তর বুদ্ধের আবির্ভাবকালে তিনি হংসবতী নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় তিনি পদুমুত্তর বুদ্ধের কাছে ভবিষ্যৎ জীবনে ভিক্ষুনী হওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন। পদুমুত্তর বুদ্ধ হলো। গৌতম বুদ্ধের পূর্বেকার এক বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধের সময় তাঁর এ পূর্ব জন্মের এ বাসনা পূর্ণ হলো। এ কথা ভেবে কৃশা গৌতমী নিজের জীবন সম্পর্কে বললেন ''আমি আজ বেদনামুক্ত, ভারমুক্ত,আমার সমূদয় কর্তব্য শেষ হয়েছে। আমার চিত্ত পূর্ণ মুক্তি প্রাপ্ত।''

কৃশা গৌতমী জীবনী থেকে আমরা শিখতে পারি যে, ভাল চিন্তা ও ভাল কাজের ফল কখনো বৃথা যায় না। সচেতনভাবে সবসময় ভাল কাজের প্রতি আমাদের আগ্রহশীল হওয়া উচিত।

সারসংক্ষেপ :

কৃশা গৌতমী দরিদ্র গৃহের একজন সাধারণ নারী। তিনি একমাত্র পুত্র সন্তানের মৃত্যুতে শোকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে তিনি বুদ্ধের কাছে গিয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, কেউ মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রেহাই পায় না। তিনি বুঝতে সমর্থ হলেন জন্মের সাথে মৃত্যু একই সূত্রে গাথা। ''জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য।'' এ মৃত্যু সময়েও হতে পারে , অসময়েও হতে পারে। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট কাল নেই। এই বোধ উদয় হলে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। তিনি বুদ্ধের ভিক্ষুণীসংঘে দীক্ষা গ্রহণ করে মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কৃশা গৌতমী কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন।?

ক. শ্রাবস্তী নগরে খ. কুশী নগরে

গ. বৈশালী নগরে ঘ. শালনগরে

২। অবশেষে কৃশা গৌতমী মৃত সন্তানকে কী করেছিলেন ?

ক. যথাপোযুক্ত চিকিৎসা খ. যথাপোযুক্ত সেবা

গ. যথাপোযুক্ত সৎকার ঘ. যথাপোযুক্ত মানুষ

উত্তরমালা : ১. ক, ২. গ

পাঠ-১২.৬ রাজা বিম্বিসার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাজা বিম্বিসারের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে রাজা বিম্বিসারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাজা বিম্বিসারের পরমতসহিষ্ণু মনোভাব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মগধরাজ, রাজগৃহ, মহাপদ্ম, সুশাসক, রাজা প্রদ্যোৎ, নালন্দা, পণ্ডিত ভিক্ষুশীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার, ধর্মতত্ত্ব জ্ঞাত।

রাজা বিম্বিসার ছিলেন একজন প্রাচীন ভারতীয় রাজা। গৌতম বুদ্ধের সমকালীন রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম । তাঁর রাজ্যের নাম ছিল মগধ রাজ্য। গৌতম বুদ্ধের সময় প্রাচীন ভারতের যে ষোলটি জনপদ বা রাজ্যের কথা জানা যায় তার মধ্যে মগধ রাজ্য অন্যতম। বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশ অঞ্চলেই ছিল মগধ রাজ্যের অবস্থান। মগধ তখন অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। রাজধানী ছিল রাজগৃহ । বিম্বিসার অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। রাজা বিম্বিসারই মগধ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাপক।

রাজা বিম্বিসারের জীবন কথা

বিম্বিসারের পিতার নাম ভট্টিয় বা মহাপদ্ম। রাজা মহাপদ্ম অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন। বিম্বিসার রাজা হয়ে পিতার পরাজয়ের গ্লানি মুছতে পেরেছিলেন। তিনি অঙ্গ রাজাকে পরাজিত করে অঙ্গরাজ্য নিজের অধিকারে নিয়ে আসেন। এ জয়লাভ থেকে মগধ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। বর্তমান পূর্ব বিহারই ছিল তৎকালীন অঙ্গ রাজ্য। ১৫ বছর বয়সে বিম্বিসারকে পিতা রাজপদে অভিষিক্ত করেন।। কোসলের রাজকুমারীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ে উপলক্ষে কোসল রাজ বিম্বিসারকে কাশির একটি গ্রাম উপহার দেয়। সেই গ্রাম থেকে তাঁর কোষাগারে অনেক রাজস্ব আসত।

রাজা বিম্বিসার কোশল ও বৈশালীর রাজবংশগুলোর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এটি তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। তিনি গান্ধার রাজ্যে রাজদূত প্রেরণ করেন। এতে দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। অবন্তীর রাজা প্রদ্যোৎ-এর সঙ্গে তিনি মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। প্রাচীন রাজগৃহ নগরী তিনি নির্মাণ করেন। সেই রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। রাজগৃহের অদূরে ঐতিহাসিক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন বাঙালি পণ্ডিত ভিক্ষু শীলভদ্র। পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করও সেখানে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন। বিম্বিসারের সাম্রাজ্য সীমা ছিল বহুদূর বিস্তৃত। তাঁর সাম্রাজ্যে আশি হাজার শহর ছিল বলে খ্যাত আছে। তিনি এই শহরগুলোর মধ্যে আন্তঃ যোগাযোগের সুবন্দোবস্ত করেছিলেন।

রাজা বিম্বিসার সুশাসক ছিলেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি সব সময় ভাবতেন। রাজধানী রাজগৃহ পাঁচটি পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তাঁর রাজপ্রাসাদের চারদিকে পাথরের প্রাচীর ছিল। তার ধ্বাংসাবশেষ এখনও আছে। এই রাজ্যের মাটি উর্বর ছিল। প্রচুর ফসল হতো। পাটনার কাছে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হিরণ্যবতী বা শোন নদী তাঁর রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল।

যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর সৈন্যবাহিনী খুব পারদর্শী ছিল। যুদ্ধে তিনি হাতি ব্যবহার করতেন। ফলে যুদ্ধে জয় তাঁর পক্ষে সহজতর ছিল। তাঁর সময় থেকে ছোট ছোট রাজ্যগুলো আস্তে আস্তে বড় রাজ্যে পরিণত হতে থাকে। মগধের অনেক প্রদেশকে তিনি স্বায়ত্ব শাসনের অধিকারও দিয়েছিলেন। বিম্বিসারের জীবিতকালেই তাঁর পুত্র অজাতশত্রু রাজা হন। পরে দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু পিতৃ বিরোধী হয়ে ওঠেন। এক সময় পিতাকে তিনি কারারুদ্ধ করেন। তাঁকে খাবার দেয়া বন্ধ করা হয়। কারাগারে তাঁর সাথে কাউকে দেখা সাক্ষাৎ করতে দেয়া হতো না। কিন্তু রানি লুকিয়ে খাবার দাবার নিয়ে যেতেন। অজাতশত্রু একসময় এটি বুঝতে পারেন। তখন তিনি এটিও বন্ধ করে দেন। শেষে বিম্বিসার অনাহারে কারাগারে দেহ ত্যাগ করেন। তখন রাজা বিম্বিসারের বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

বুদ্ধ ও রাজা বিম্বিসার

রাজা বিম্বিসারের সাথে বুদ্ধের প্রথম সাক্ষাৎ হয় বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে। তখন বুদ্ধ ছিলেন একজন সংসার ত্যাগী রাজপুত্র। দুঃখ মুক্তির সন্ধানে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হিসেবে তিনি পরিভ্রমণরত ছিলেন। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পরম সম্বোধি জ্ঞান বুদ্ধত্বলাভের ব্রত নিয়ে তিনি উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করছিলেন। এ পরিভ্রমণের শুরুতে তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে অনুপ্রিয় নামক আমবাগানে পৌঁছেন। সেখানে তিনি মস্তক মুণ্ডন করেন। তারপর কাষার বস্ত্র পরিধান করে সন্ন্যাস ব্রত ধারণ করেন। এসময় তিনি ভিক্ষান্নে জীবন ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। পদব্রজে পরিভ্রমণ করেন রাজ্য থেকে রাজ্য। সে সময় তিনি বৈশালী থেকে ক্রমে পৌঁছেন রাজগৃহে। উপযুক্ত গুরুর সন্ধান ও ভিক্ষান্ন সংগ্রহই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। রাজগৃহের নগর রক্ষীরা তাঁকে দেখে অবাক হন। সৌম্য শান্ত দিব্য জ্যোতি সম্পন্ন একজন যুবক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে। এ খবর তারা পৌঁছে দেন রাজা বিম্বিসারের কাছে। রাজা প্রাসাদ থেকেও বিষয়টি প্রত্যক্ষ করলেন। পরে রাজা নিজে এসে তাঁর সাথে দেখা করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানলেন। তখন রাজা তাঁকে এই কঠিন ব্রত ছেড়ে রাজসুখ ভোগ করার আহবান জানান। রাজা তাঁকে তাঁর রাজ সৈন্যদের প্রধানের পদ গ্রহণ করে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সাথে জীবন উপভোগের অনুরোধ করেন। তখন সিদ্ধার্থ বলেন- মহারাজ ! আমি সুখের প্রার্থী নই। আমি কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। বুদ্ধত্ব লাভের আশায় আমি সব কিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছি।" রাজা বলেন, বৎস, আপনার পিতা আমার পরম মিত্র। আপনার উদ্দেশ্য জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি। যদি আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন; আমাকে একবার আপনার দর্শন দেবেন। আমি আপনাকে পূজা বন্দনা করবো। শুনে সিদ্ধার্থ সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলেন।

বুদ্ধের সাথে রাজা বিম্বিসারের পরবর্তি দেখা হয় বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পর। বোধিলাভের দ্বিতীয় বছরে রাজা বিম্বিসারের সাথে বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধ যখন রাজগৃহের লট্‌ঠিবনোদ্যানে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন লোকমুখে তাঁর গৌরব কীর্তি শুনে বিম্বিসার তাঁর সাথে দেখা করেন। বিম্বিসার বুদ্ধের কাছে তাঁর নতুন ধর্মের বাণী শোনার প্রার্থনা জানান। বুদ্ধ তাঁকে দান, শীল ও স্বর্গ সম্বন্ধে সরলভাবে উপস্থাপন করেন। এরপর চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে উপদেশ দেন। বিম্বিসার বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ শুনে মুগ্ধ হয়ে হন। তিনি বুদ্ধের গৃহী শিষ্য হন। এ সময় রাজা বিম্বিসারের বয়স হয়েছিল ২৯ বছর । সে সময় রাজা ভিক্ষুসঙ্ঘসহ বুদ্ধকে প্রসাদে নিমন্ত্রণ গ্রহণের অনুরোধ জানালেন । বুদ্ধ সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রাসাদে গিয়েও রাজাকে নানা ধর্ম কথা শোনালেন। রাজা এই ধর্মতত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে আনন্দ চিত্তে বুদ্ধকে বললেন – প্রভূ! শৈশবকালে আমার পাঁচটি কামনা ছিল। তা আজ পূর্ণ হলো। সেগুলো হলো –

১. আমি ভবিষ্যতে রাজপদে অভিষিক্ত হবো,
২. আমার রাজ্যে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অবতীর্ণ হবেন,
৩. আমি সেই বুদ্ধকে সেবা ও পরিচর্যা করবো,
৪. সেই ভগবান বুদ্ধ আমাকে ধর্মোদেশ প্রদান করবেন,
৫. আমি বুদ্ধের ধর্ম উপলব্ধি করবো।

এর পর রাজা অত্যন্ত শ্রদ্ধা চিত্তে রাজ্যের বিখ্যাত বেনুবনোদ্যান বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করে দিলেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে বিম্বিসারের অবদান

বুদ্ধের গৃহী শিষ্য হিসেবে দীক্ষিত হওয়ার পর হতে ৩৬ বছর তিনি নানাভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করেন। এ ধর্ম গৃহীদের আচরণের অনুমতি প্রদানের জন্য রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের কাছে নিবেদন করেছিলেন। বুদ্ধ তা

অনুমোদন করেছিলেন। এবং বুদ্ধ এ বিষয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘদেরও আদেশ দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকে ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক গৃহীদের পঞ্চশীল ও অষ্টশীল দেয়ার প্রচলন শুরু হয়।

এ সময় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের আচার্যগণ প্রত্যেক মাসের অষ্টমী, চতুদর্শী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় মিলিত হয়ে ধর্মের আলোচনা করতেন। সাধারণ লোকেরা তাঁদের কাছে ধর্মকথা শুনে আচার্যদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে তাঁদের ধর্মে দীক্ষা নিতেন। রাজা বিম্বিসার এসব লক্ষ্য করে ভিক্ষুদের জন্যও ঐ সব তিথিতে ধর্মালোচনার নিয়ম প্রবর্তন করার জন্য ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানান। বুদ্ধ তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এভাবে বিম্বিসার ভিক্ষুদের জন্য উপোসথের ব্যবস্থা করেন। রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক ছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের বিখ্যাত চিকিৎসক জীবক। রাজা বিম্বিসারের নির্দেশে তিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের চিকিৎসাও করতেন।

সারসংক্ষেপ :

রাজা বিম্বিসার ছিলেন প্রাচীন ভারতের মগধ রাজ্যের রাজা। তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের সমকালীন রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। বুদ্ধের জীবদ্দশা কালে মগধ তখন অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। রাজধানী ছিল রাজগৃহ । রাজা বিম্বিসার এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ছোটকালে রাজা বিম্বিসার পাঁচটি বিষয়ে কামনা করেছিলেন। বুদ্ধের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে সেগুলো তিনি পূর্ণ করেছিলেন। তিনি বুদ্ধের গৃহী শিষ্য হিসেবে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি ৩৬ বছর নানাভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করে জগতে খ্যাত হয়ে আছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাজা বিম্বিসারের রাজ্যের নাম কী?

ক. রাজগৃহ খ. পাটালিপুত্র

গ. মগধ ঘ. পাটগ্রাম

২। রাজা বিম্বিসার ও রাজা অজাতশত্রুর সম্পর্ক কী ?

ক. গুরু-শিষ্য খ. মামা-ভাগিনা

গ. পিতা-পুত্র ঘ. পরস্পর শত্রু

৩। প্রাচীন রাজগৃহ কোন রাজ্যের রাজধানী ছিল?

ক. কাশী খ. কোশল

গ. অঙ্গ ঘ. মগধ

উত্তরমালা : ১. গ, ২. গ, ৩. ঘ

পাঠ-১২.৭ রাজা প্রসেনজিৎ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাজা প্রসেনজিৎ কে ছিলেন বলতে পারবেন।
- রাজ্য প্রসেনজিৎ-এর জীবনী লিখতে পারবেন।
- রাজা প্রসেনজিতের অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কোশল রাজ্য, বুদ্ধের পরম ভক্ত, মল্লিকা, বৌদ্ধসাহিত্য, বাসবক্ষত্রিয়া বিড়ূব, দানশীল, মহাদান, মল্লিকারাম, প্রধান মহিষী।

রাজা প্রসেনজিৎ

রাজা প্রসেনজিৎ ছিলেন কোশলরাজ্যের অধিপতি । বয়সের দিক থেকে রাজা প্রসেনজিৎ ছিলেন গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক। তাঁর সমকালীন প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মগধরাজ বিম্বিসার, উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোত ও কৌশাম্বীরাজ উদয়ন প্রমুখ । কোশল রাজ্যের অবস্থান ছিল মগধ রাজ্যের উত্তর–পশ্চিম দিকে। কোশলের দক্ষিণে ছিল গঙ্গা নদী। পূর্বে ছিল হিমালয়। এর রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তী ছিল প্রাচীন ভারতের এক প্রসিদ্ধ নগরী। এর অবস্থান হলো বর্তমান গোরক্ষপুর হতে সত্তর মাইল উত্তর–পশ্চিমে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার কাছে।

তথাগত বুদ্ধ পাঁচশত শিষ্যসহ বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করতে করতে শ্রাবস্তীর জেতবনে পৌঁছুলে রাজা প্রসেনজিৎ তাঁর সাথে দেখা করেন। রাজা সশিষ্য বুদ্ধকে প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেন। তখন বুদ্ধ তাঁকে সদ ও মন্দ কাজের ফল সম্বন্ধে উপদেশ দেন। বুদ্ধের কাছে ধর্মকথা শুনে তিনি বুদ্ধের একজন পরম ভক্ত হন। তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ধর্মীয় ও পারিবারিক প্রভৃতি অনেক বিষয়েই তিনি বুদ্ধের উপদেশ নিতেন। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য তিনি শ্রাবস্তীতে অনেক বিশ্রামাগার ও বিহার নির্মাণ করে দান করেন।

প্রসেনজিতের বোনের সঙ্গে রাজা বিম্বিসারে বিয়ে হয়। রাজা বিম্বিসার যৌতুকরূপে কাশী লাভ করেন। পরে পুত্র অজাতশত্রু পিতাকে কারাবন্ধী করলে বিম্বিসারের মৃত্যু ঘটে। এতে প্রসেনজিৎ কাশী রাজ্য ফিরিয়ে নেন। এই সূত্রে প্রসেনজিতের সঙ্গে অজাতশত্রুর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে আসার পথে মল্লিকা নামের এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যার সাথে দেখা হয়। প্রসেনজিৎ তাকে বিয়ে করেন। তিনি মল্লিকাকে প্রধান মহিষী করেন। এই মল্লিকা বৌদ্ধ সাহিত্যে 'কোশল মল্লিকা দেবী' নামে পরিচিত।

রাজা প্রসেনজিৎ কপিলাবস্তুর শাক্যবংশীয় কন্যা বিয়ে করার জন্য সেখানে দূত পাঠান। সে সময় শাক্যরা নিজ সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক হতো না। প্রসেনজিৎ ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজা। তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে শাক্যদের বিপদ হতে পারে ভেবে তারা বিকল্প ব্যবস্থা করেন। এ সময় শাক্যদের রাজা ছিলেন মহানাম। মহানামের এক কন্যা বাসবক্ষত্রিয়া নাগমুণ্ডা দাসীর গর্ভে জন্মে ছিল। তাঁকে তিনি প্রসেনজিৎ-এর সঙ্গে বিয়ে দেন। বাসবক্ষত্রিয়ার এক পুত্র হয়। তার নাম বিড়ুঢ়ভ। বিড়ুঢ়ভ মামাবাড়িতে এসে কখনো মর্যাদা পেতেন না। শাক্যরা একবার বিড়ুঢ়বকে দাসীর পুত্র বলে অপমানও করে। বিড়ুঢ়ব এতে খুব ক্ষিপ্ত হন। তিনি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এক

সময় বিড়ুঢ়ব কপিলাবস্তু আক্রমন করেন এবং শাক্যদের নির্মূল করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে দেশে ফেরার সময় তিনি জলপ্লাবনে সসৈন্যে নিহত হন।

রাজা প্রসেনজিৎ এর সময় কোশল রাজ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। শ্রাবস্তী ছিল কোশল রাজ্যের রাজধানী। এটি বৌদ্ধদের একটি প্রধান তীর্থস্থান।

রাজা প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তীর জেতবনে রাজকারাম বিহার নির্মাণ করান। প্রসেনজিৎ তাঁর প্রধান মহিষী মল্লিকাদেবীর অনুরোধে এখানে একটি অতিথিশালা নির্মাণ করেন। এটি 'মল্লিকারাম' নামে খ্যাত। এখানে বুদ্ধ ধর্মদেশনা করতেন। শ্রাবস্তীর অদূরে একটি গভীর বন ছিল। তার নাম ছিল অঞ্জন বন। বুদ্ধের শিষ্য গবম্পতি এখানে বাস করতেন। থেরী সুজাতা এখানে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণের পর হতে প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকেন।

প্রসেনজিৎ দানশীল রাজা ছিলেন। একবার তিনি বুদ্ধকে পাঁচশত শিষ্যসহ জেতবনে নিমন্ত্রণ করেন। তখন তিনি নগরবাসীদের ডেকে বলেন, তোমরা এসে আমার দান দেখো। নগরবাসীরা রাজার দান দেখলেন। তারপর নগরবাসীরাও বুদ্ধকে শিষ্যসহ নিমন্ত্রণ করে রাজাকে বললেন, মহারাজ, আপনি আমাদের দান দেখুন। রাজা তাঁদের দান দেখে ভাবলেন প্রজারা আমার চেয়ে অনেক বেশি দান করেছে। আমি আবার মহাদানের ব্যবস্থা করবো। এভাবে রাজা ও প্রজাদের মধ্যে দানের প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় রাজা বার বার পরাজিত হয়ে ভাবলেন, আমি প্রজাদের মতো দান কখনও দিতে পারব না।

রানি মল্লিকা এ বিষয়ে জানতে পেরে একটি বড় দানের আয়োজন করেন। রাজা নিজের হাতে ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করলেন। তাঁর কর্ম ও তাঁর সৃষ্টি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

সারসংক্ষেপ :

প্রাচীন ভারতের কোশল রাজ্যের রাজা প্রসেনজিৎ গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। শ্রাবস্তীর জেতবনে রাজা প্রসেনজিতের সাথে গৌতমবুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধের কাছে ধর্মকথা শুনে তিনি বুদ্ধের একজন পরম ভক্ত হন। রাজা প্রসেনজিতের প্রধান মহিষীর নাম মল্লিকা দেবী। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য তিনি শ্রাবস্তীতে অনেক বিশ্রামাগার ও বিহার নির্মাণ করে দান করেন। অন্য রাজাদের মতো যুদ্ধ ও রাজ্যবিস্তারে রাজা প্রসেনজিতের কোনো আনন্দ ছিল না। তিনি সম্প্রীতির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর সৃষ্টিশীল অবদান বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাজা প্রসেনজিৎ কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন ?

ক. মগধ রাজ্যের খ. অঙ্গ রাজ্যের

গ. কাশী রাজ্যের ঘ. কোশল রাজ্যের

২। শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য কে অনেক বিশ্রামাগার ও বিহার নির্মাণ করে দান করেন ?

ক. রাজা প্রসেনজিৎ খ. রাজা বিম্বিসার

গ. রাজা বিড়ুঢ়ব ঘ. রাজা প্রদ্যোৎ

৩। মল্লিকাদেবী রাজা প্রসেনজিতের কী ছিলেন?

ক. প্রধান সেনানী খ. প্রধান উপদেষ্টা

গ. প্রধান মহিষী ঘ. প্রধান রক্ষী

উত্তরমালা : ১. ঘ, ২. ক, ৩. গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

সুভাস চাক্‌মা একজন সাধারণ সংসারি মানুষ। তিনি বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে নিয়মিত প্রার্থনাদি করেন। মাজে মাঝে তিনি তিনি বিহারের পাঠাগার ব্যবহার করতেন। একদিন পাঠাগারে একটি বই পড়তে গিয়ে তিনি সারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন ও কিসা গৌতমীর জীবনী সম্পর্কে জানলেন। এটি পাঠের মাধ্যমে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন বিষয়েও অনেক কিছু অবগত হলেন। তিনি উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন যে জগতে স্থিত বা নিত্য কোনো কিছুই নাই।

ক. অগ্রশ্রাবক কী?

খ. বিশাখাকে কে, কেন দশটি উপদেশ প্রদান করেছিলেন।

গ. 'জগতের সকলই অনিত্য, এতে আবেগ তাড়িত হওয়া অনুচিত' তোমার পাঠ্য বইয়ে বর্ণিত কাহিনী অবলম্বনে এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের জীবনী হতে ত্যাগ ও সত্যান্বেষণ বিষয়ে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি আলোচনা কর। ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

অসীম বাবু ভিক্ষু ধর্মদেশনা শ্রবণ করতে গিয়ে থেরী পূর্ণিকা সর্ম্পকে জানতে পারেন। ভিক্ষু বললেন, তিনি ছিলেন একজন দরিদ্র নারী। দাসী বৃত্তি করে জীবন নির্বাহ করতেন। কিন্তু তার উপলব্ধিবোধের মাধ্যমে তিনি এক ব্রাহ্মণকে ভ্রান্ত ধারণা থেকে উত্তরণ ঘটালেন। পরবর্তীতে তিনি বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হয়ে অরহত্ব ফলে উন্নীত হন।

ক. থেরী কাকে বলে?

খ. কিভাবে অর্হত্বফল লাভ করা যায়?

গ. থেরী পূর্ণিকা কোন ব্রাহ্মণকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. থেরী পূর্ণিকা প্রদত্ত উপদেশের বাস্তবতা সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যাক্ত কর।